নীহাররঞ্জন রায়

নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) ভারতের শেষ বহুশাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম একজন। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- শিল্পকলা, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি এবং জীবনকাহিনীসহ নানা বিষয়ে তিনি বিচরণ করেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন। শিল্প-ইতিহাস চর্চায় তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন এবং এ বিষয়টিই ইতিহাসের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণার ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। মানব অভিজ্ঞতার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনে তাঁর প্রয়াস পরিণতি লাভ করেছে তাঁর প্রধান সাহিত্যকর্ম বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থে। এই ক্লাসিক সৃষ্টি রাজনৈতিক পরিভাষায় ইতিহাস বিশ্লেষণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটায় এবং তা সাধারণ মানুষকে ইতিহাসবিদদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে। গ্রন্থটির সাহিত্যমূল্যের ক্ষেত্রে এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নীহাররঞ্জন রায়

কর্মজীবনে তিনি বিবিধ পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন গ্রন্থাগারিকের পদে কাজ করার পর তিনি চারুকলা বিভাগের বাগেশ্বরী অধ্যাপক এবং প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রাজ্যসভা ও ভারতীয় পে-কমিশনের সদস্যও ছিলেন। সিমলার ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থগার ও ভারতীয় জাদুঘরের মতো সংস্থাগুলির প্রশাসনেও তিনি কাজ করেছেন। তিনি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক, Royal Asiatic Society, International Association of Arts and Letters (জুরিখ) এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো ছিলেন। তিনি 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার' ও ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ'-এর মতো সম্মানজনক উপাধি লাভ করেন।

নীহাররঞ্জন রায় ১৯০৩ সালে ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন স্থানীয় ন্যাশনাল স্কুলে, যেখানে তাঁর পিতা শিক্ষকতা করতেন। সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ স্নাতক (১৯২৪) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে ১৯২৬ সালে এম.এ পাস করেন। ঐ বছরই তিনি তাঁর Political History of Northern India, AD 600-900' নিবন্ধের জন্য 'মৃণালিনী স্বর্ণপদক' পান। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ সালে কিছুকাল তিনি তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়ার সঙ্গে বার্মায় কাটান এবং একত্রে বার্মিজ মন্দির স্থাপত্যের উপর ব্যাপক গবেষণা চালান। এ গবেষণার ফলে কারুশিল্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গভীর হয় এবং তিনি উপলব্ধি করেন যে সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিমন্ডল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে শিল্পকলা সম্পর্কে অধ্যয়ন করা যায় না। বার্মাতেই তাঁর মনে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অবিচ্ছিন্নতার ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হয়, যা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থে।

বার্মা থেকে কলকাতা ফিরে তিনি বর্মী ও মন (Mon) ভাষা শেখেন এবং বার্মার কারুশিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে গভীর পড়াশোনা শুরু করেন। এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানজনক প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির (PRS) জন্য একটি

নিবন্ধ পেশ করে ১৯২৮ সালে সেই বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে তিনি কয়েকবার বার্মায় গবেষণা সফরে যান এবং বর্মী কারুশিল্প ও ধর্ম সম্পর্কে তিনটি বই প্রকাশ করেন: Sanskrit Bhuddhism in Burma (১৯৩৬), An Introduction to the Study of Theravada Buddhism in Burma (১৯৪৬), Art in Burma (১৯৫৪)। ১৯৩৩ সালে তিনি ইউরোপ যান এবং লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Letters and Philosophy বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

উনিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে নীহাররঞ্জনের মানসগঠনকালে বাংলা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগাত্মক আবহের উদার মানবতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর কাজের জগতে মানুষ ও তার পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা-ই তাঁকে আগ্রহী করে তুলেছে এবং আবেগ ও বুদ্ধি দিয়ে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। সমকালীন দুজন ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম তাঁর মধ্যে উদার মানবিক ভাবমূর্তির সৃষ্টি করে। বহুমুখী সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে পরিস্ফুট রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক সর্বজনীন কৌতূহল বরাবরই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

নীহাররঞ্জন অনুশীলন সমিতির মতো উগ্র জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী দলের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগ দেন। ভারতের বিপ্লবী সোশ্যালিস্ট পার্টিও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিবাদী অংশের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি গান্ধী, নেহরু ও মার্কসের মতো ব্যক্তিদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বিশেষত শিল্পকলা ও ধর্মের ছাত্র হিসেবে নীহাররঞ্জন ভারতীয় সনাতন চারুকলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধরন এবং মূল্যবোধের উৎপত্তি ও বিবর্তনের দিকে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে উপনিষদ ও আরণ্যকে বিধৃত ভারতীয় অনুধ্যানী চিন্তনের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তার প্রভাবেই বহুলাংশে রূপলাভ করে তাঁর কল্পনা ও চিন্তাধারা। একইভাবে উনিশ শতকের ইউরোপীয় প্রত্যক্ষবাদী ও বস্তুবাদী চিন্তা, বিশেষত মার্কসীয় চিন্তাধারা তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছিল।

স্কুলে অধ্যয়নকালে নীহাররঞ্জন অনুশীলন ও যুগান্তরের মতো প্রসিদ্ধ বিপ্লবী দলের সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত অনুশীলন দলের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন। কলেজ জীবনে তিনি ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং গ্রাম পর্যায়ে কংগ্রেসের কাজে জড়িত থাকেন। ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে নীহাররঞ্জন কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এবং ১৯৪২-৪৩ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনে পুনরায় যোগ দেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকালে ১৯৪২ সালে তিনি কারাবন্দি হন এবং জেলখানায়ই বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনার কাজ শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর নীহাররঞ্জন রায় সক্রিয় রাজনীতিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন, যদিও আট বছর রাজ্যসভার সদস্যপদে আসীন থেকেছেন। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তাঁকে স্বদেশ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল, জনঘনিষ্ঠ করেছিল। রাজনীতি তাঁকে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যায় এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের এবং দেশের ব্যাপক পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটিয়ে দেয়।

ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে নীহাররঞ্জনের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটে তা তাঁর রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৩৯) গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল লেখাগুলিকে এদের সংশ্লিষ্ট সামাজিক পটভূমিতে উপস্থাপন করতে এবং সেগুলি রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণা, বিষয়বস্তু, প্রকৃতি, আকার ও রীতিকে কিভাবে

কতটা প্রভাবিত করেছে তা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। রায়ের অভিগম ও পদ্ধতির পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তাঁর Maurya and Sunga Art (১৯৪৭) এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৯৪৯) গ্রন্থ দুটিতে। পূর্বোক্ত গ্রন্থটির পরিমার্জিত ও বর্ধিত সংস্করণ Maurya and Post-Maurya Art শিরোনামে প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৩ সালে তিনি দুটি বই প্রকাশ করেন: Nationalism in India ও Idea and Image of Indian Art. তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা হচ্ছে: Mughal Court Painting (১৯৭৪), The Sikh Gurus and the Sikh Society (১৯৭০), Dutch Activities in the East (সম্পাদিত, ১৯৪৬), An Approach to Indian Art (১৯৭৪)।

ভারতীয় ইতিহাস রচনার যে ঐতিহ্য নিয়ে নীহাররঞ্জন তাঁর Political History of North India (১৯২৬) লিখেছিলেন তা পুরোপুরিই ছিল পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত এবং উপর থেকে দেখা বিখ্যাত লোক ও তাদের কার্যকলাপের বিবরণ। রায়ের শিক্ষাজীবনের সময়কালে বাঙালি সংস্কৃতিতে দিকবদলের সূচনা ঘটেছিল। কলাবিদ্যা, বিশেষত সাহিত্য তখন 'ভদ্রলোকের' দখলদারি থেকে মুক্তি পেয়ে ক্রমেই জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন আপনজন হিসেবে সাধারণ মানুষের কাহিনী। নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়ের মতো শিল্পিরা মাঠের কৃষক, কারখানার শ্রমিকের মতো সাধারণ মানুষের দিকে নজর দিচ্ছিলেন। সেই কালপর্বে জাতীয়তাবাদী উপাদানের সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানের মিলন ঘটেছিল এবং তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল দীনেশচন্দ্র সেনের সাহিত্যকর্মে। সাধারণ মানুষের উন্নতি এবং জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় সন্ধান ছিল নীহাররঞ্জনের বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থের চালিকাশক্তি এবং এটি ছিল সাধারণ মানুষকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে দাঁড় করিয়ে একটি জাতীয়তাবাদী বক্তব্য।

নীহাররঞ্জনের পান্ডিত্য বহুক্ষেত্রে বিচরণশীল। ইংরেজিতে লেখা সত্তরটির বেশি ও বাংলায় লেখা ছত্রিশটি প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ভাষণ এবং ইংরেজিতে পনেরটি ও বাংলায় সাতটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল ইতিহাস, চারুকলা, স্থাপত্য, নৃবিদ্যা, লিপিতত্ত্ব, ধর্ম, সাহিত্য, সমসাময়িক রাজনীতি এবং গান্ধী, নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বাঙ্গালীর ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকে মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের বাঙালির ইতিহাসের একটি সুবিশাল গ্রন্থ। এটি প্রকৃত অর্থেই বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বোঝার জন্য একাধারে পথনির্দেশক ও ভিত্তিস্তম্ভ।

পঁয়ত্রিশ বছরেরও অধিককাল নীহাররঞ্জন রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন রিসার্চ ফেলো, প্রভাষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র ক্যালকাটা রিভিউ-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, মুখ্য গ্রন্থাগারিক, রিডার ও প্রফেসর। তিনি স্বেচ্ছায় শিক্ষকতা পেশা বেছে নেন, ছেড়ে আসেন সাংবাদিকতা যেখানে সুভাষ বসুর ইংরেজি দৈনিক লিবার্টির সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৮১ সালে মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড লেখার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তিনি মনে করেন যে, এটাই হবে তাঁর 'সামান্য' বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের 'সর্বাধিক আনন্দময় পরিণতি'। কিন্তু তা আর পূর্ণ হয়নি।